চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেন

মীর শামছুল আলম বাবু

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেন

মীর শামছুল আলম বাবু

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেন
মীর শামছুল আলম বাবু

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
হারুনর রশীদ

প্রকাশকাল
জুন ২০১৬
আষাঢ় ১৪২৩

প্রচ্ছদ
আবির শ্রেষ্ঠ/চিত্রম

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ শরীফুল ইসলাম

মুদ্রণ
কথা এন্টারপ্রাইজ
৩৩ তোপখানা রোড, মেহেরবা প্লাজা, ঢাকা।

মূল্য : ২০০/- (দুইশত টাকা মাত্র)

Chitrosompadok Basir Hossain (Film Editor Basir Hossain) by Mir Shamsul Alam Baboo. Copyright & Publisher : Bangladesh Film Archive, 121 Kazi Nazrul Islam Avenue, Shahbag, Dhaka-1000.
Phone : +88 02 9672259, 9674284, Fax : +88 02 9613867
E-mail : bfarchivebd@gmail.com; Webside : www.bfa.gov.bd

First Edition : June 2016; Ashar 1423
Price : 200/- (Two Hundred Taka Only).
ISBN: 978-984-34-0837-2

উৎসর্গ

আমার সবচেয়ে প্রিয় দুই জন–

বাবা মরহুম মীর আব্দুস সামাদ

ও

মা হোসনে আরা বেগম

মহাপরিচালকের কথা

চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যম চলচ্চিত্রে ঘটেছে সবগুলো শিল্পকলার সংমিশ্রণ। চলচ্চিত্র নির্মানের জন্য অনেক ধরনের কলাকুশলীর অবদান প্রয়োজন। পরিচালক, চিত্রগ্রাহক এরপর যে কুশলীর অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা চিত্রসম্পাদক। চিত্রনাট্যকারের লিখিত চিত্রনাট্য, শিল্পিদের অভিনয় এবং পরিচালকের ভাবনায় চিত্রগ্রাহকের দৃশ্যগ্রহণে যে সব দৃশ্য গৃহীত হয়েছে সেগুলো থেকে বাছাই করে একটি চলচ্চিত্র চুড়ান্তভাবে নির্মাণ করাই একজন চিত্রসম্পাদকের কাজ। এজন্য অনেকে চিত্রসম্পাদককে দ্বিতীয় পরিচালকও বলে থাকেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস ছয় দশকের। এই ছয় দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই বহু কলাকুশলী এদেশের চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের মধ্যে চিত্র সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকটিতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে শৈল্পিক দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন যে চিত্রসম্পাদক- তিনি বশীর হোসেন (১৯৩৪-১৯৭৮)। মাত্র ৪৪ বছরের জীবনের শেষ ২০ বছরই তিনি চিত্রসম্পাদনায় নিয়জিত ছিলেন। এদেশের চলচ্চিত্র তাঁর সম্পাদনা কুশলতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণের পাশাপাশি 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র সাহিত্য রচনা ও গবেষণার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেনের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা কর্মটিও তেমনি একটি উদ্যেগ।

গবেষক মীর শামছুল আলম বাবু চলচ্চিত্র সম্পাদনা এবং এদেশের সবচেয়ে কুশলী সম্পাদক বশীর হোসেনকে নিয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্রটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে শুধু বশীর হোসেনের জীবন ও কর্ম নয় বরং চিত্রসম্পাদনার কারিগরি দিকও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা গ্রন্থটি সংশ্লিষ্টদের কাজে লাগবে আশা করি।

আমি গবেষক মীর শামছুল আলম বাবু, তত্ত্বাবধায়ক চিত্রপরিচালক হারুনর রশীদ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সহকর্মীসহ যারা এ গ্রন্থের জন্য পরিশ্রম করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জুন ২০১৬/ আষাঢ় ১৪২৩

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

তত্ত্বাবধায়কের কথা

একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন পর্যন্ত যে পথ পরিক্রমা তাতে যুক্ত থাকেন একজন দু'জন নয়, বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ। এইসব মানুষকে আমরা মোটা দাগে দু'ভাগে ভাগ করে থাকি, শিল্পী আর কুশলী। শিল্পী বলতে সাধারণত নারীপুরুষ অভিনয় শিল্পী (এমনকি কণ্ঠশিল্পীরাও বাদ পড়ে থাকেন!)। আর কুশলী বলতে আমরা বুঝে থাকি চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত অন্তত ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তারও অধিক সংখ্যক মানুষজন। যেমন কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার থেকে শুরু করে পরিচালক, সহকারী পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, রূপসজ্জাকারী, প্রোডাকশন ম্যানেজার, শিল্প নির্দেশক, গীতিকার, সংগীত পরিচালক, শব্দগ্রাহক, সম্পাদক প্রমুখ। অনুক্ত রইলো হয়তো আরও অনেক। পরিচালকের হাতে সুতোটি ধরা থাকে ঠিকই, তবে চলচ্চিত্র নির্মাণকালে এইসব মানুষেরা যার যার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেই খালাশ। কারো মধ্যেই ছবি নির্মাণের সমগ্রতা থাকে না। তারপরও ওই যে কথায় আছে, চলচ্চিত্র তো আসলে তৈরি হয় সম্পাদনা টেবিলে। সম্পাদকই আদতে সামগ্রিকভাবে একটি চলচ্চিত্র খাড়া করেন। কোন্ জিনিস কোথায় কিভাবে পড়ে আছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সবকিছুই বিক্ষিপ্ত। গুণাগুণ বিচার করে সেসব জড়ো করে মালা গাঁথার মতো করে পরপর সাজিয়ে অবশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের অবয়ব দাঁড় করানোর দায়িত্ব যার উপরে পড়ে তিনিই হচ্ছেন সম্পাদক। ভালো-খারাপ অভিনয়, ভালো-খারাপ আলোকচিত্র - এসবের বাছবিচার তাকেই করতে হয়। গল্পের গতির দিকে নজর রেখে দৃশ্যে দৃশ্যে নাটকীয়তা তৈরি, দৃশ্যকে প্রবলভাবে আবেগঘন কিংবা ব্যঞ্জনাময় করে তোলা ইত্যাদির কাজগুলোও সুচারুভাবে তাকেই করতে হয়। পর্দায় অভিনয়শিল্পীদের তাৎক্ষণিক নীরব প্রতিক্রিয়া কতটুকু স্থায়ী হবে সে সিদ্ধান্তও তার। টাইম এ্যাণ্ড স্পেস্ – একজন দক্ষ সম্পাদকের কাছে এটাই মোদ্দা কথা।

বশীর হোসেন ছিলেন স্বীকৃতভাবেই এ দেশের তেমনি একজন দক্ষ ও খ্যাতিমান চলচ্চিত্র সম্পাদক। শুধু এ দেশই বা বলি কেন, তার কার্যকালে বলা হতো – হাতের গণনায় সমগ্র পাক ভারত উপমহাদেশে যে ক'জন সম্পাদককে আমলে নেয়া যায় তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। পেশার প্রতি ছিল তার অসাধারণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। আর ছিল অসম্ভব রকমের একটা অনিসন্ধিৎসু মন। যার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রশ্নে যারা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙেন তাদেরও তিনি ছাপিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তার নিজের ও অন্যদের কাজ পাশাপাশি দেখলে

প্রসঙ্গ কথা

চলচ্চিত্র সম্পাদনা–একটি কারিগরি ও নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়। এই নান্দনিক বিষয়টির সৃজনশীলতা নির্ভর করে চলচ্চিত্র সম্পাদকের মেধা ও সৃজন ক্ষমতার ওপর। চলচ্চিত্র সম্পাদকের কাজ শুধু 'কিউ' আর 'রিজাম্পশন' মিলিয়ে শট জোড়া দেয়া নয়–বরং ছবির ভাষাকে তার নিজস্ব ব্যাকরণ ও কাব্যধর্মীতার সাহায্যে সৃজন করাই সম্পাদকের দায়িত্ব। শুধু একটি দৃশ্যের সাথে আরেকটি দৃশ্যের সংযোগ স্থাপন নয় - চিত্রনাট্যকারের লেখা, পরিচালকের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা, চিত্রগ্রাহকের চিত্রগ্রহণের আলো ছায়ার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা দৃশ্যের সাথে অন্য দৃশ্যের সংযোজন, বিয়োজন, প্রতিস্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শকদের কাছে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনের কাজই একজন সৃজনশীল চলচ্চিত্র সম্পাদকের কাজ।

১৯৫৬ সাল থেকে শুরু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় যে চিত্রসম্পাদক শৈল্পিক সম্পাদনার মাধ্যমে বায়োস্কোপকে চলচ্চিত্রে উন্নীত করেছেন - তিনি বশীর হোসেন (১৯৩৪-১৯৭৮)। মাত্র ৪৪ বৎসরের জীবনের ২০ বৎসরের শিল্পজীবনে কোনরূপ পদ্ধতিগত অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই সহজাত প্রতিভা, শৈল্পিক মন ও সততা এবং কঠোর দৈহিক শ্রমমুখীতার দ্বারা সম্পাদনার মত একটি অতীব দুরূহ টেকনিককে আয়ত্বে এনে সৃজনশীলতার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন বশীর হোসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন সম্পাদনার নবতর নিরীক্ষার উন্মাদনায় তিনি নতুন সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন তখনই জানা গেল মৃত্যুদুত তাঁর শিরদাড়ার গভীরে ঘুণের বীজ ছড়িয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৩ এপ্রিল শিরদাড়ার ক্যান্সারের কারণেই তিরোধান ঘটে সেই দুর্লভ প্রতিভার-যিনি ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পাদনার একটি ইন্সটিটিউশন।

এদেশের চলচ্চিত্রের হিমায়িত ক্যানের পাঠাগার - বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে আমার যাতায়াত ছোটবেলা থেকেই। প্রথমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখতে, তারপর প্রদর্শনীর আয়োজন করতে এবং আরো পরে চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করতে আমার যাতায়াত আর্কাইভের লাইব্রেরি ও ফিল্ম ভল্টে। ২০১০ সালে প্রথম যুক্ত হই ড. রশীদ হারুনের গবেষণা কর্মের সাথে, যার বিষয় ছিল আমার চলচ্চিত্র শিক্ষক 'আব্দুস সামাদ' (১৯৩৭-২০০৪) এর 'জীবন ও কর্ম'। এরপর আর্কাইভের ফেলোশিপ নিয়ে নিজেই গবেষণা করি 'কুশলী চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম' (১৯২৭-২০১৪) এবং 'আলোর জাদুকর সাধন রায়' (১৯১৪-১৯৮৮)-দুই পথিকৃৎ চিত্রগ্রাহকের জীবন ও কর্ম নিয়ে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আবারও

গবেষণা প্রস্তাবনা আহ্বান করলে চলচ্চিত্রের পর্দার অন্তরালের আরেক দুর্লভ প্রতিভা চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেনের জীবন ও কর্মের ওপর প্রস্তাব জমা দেই এবং বিধি মোতাবেক তা গৃহীত হয়। বর্তমান গ্রন্থ সেই গবেষণারই ফলাফল।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের শুরুতে যে কয়জন চিত্রসম্পাদকের কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতা এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে বশীর হোসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম যুগের চলচ্চিত্রের কারিগরী নির্মাণের সাথে যে সব চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত বশীর হোসেন তাঁদের অন্যতম। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সোনালী সময়কে তিনি তাঁর সৃজনশীল ও শৈল্পিক সম্পাদনা কুশলতায় সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বশীর হোসেনের কর্মজীবন ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্রময়। ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহন করেন। পুরো নাম মোহাম্মাদ বশীর হোসেন মুন্সী। লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকায় আসেন, উদ্দেশ্য এমন কোন কাজ বেছে নিবেন যা হাতে কলমে করতে হয়। তেজগাও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট-এ এক বছরের ইলেকট্রিক কোর্স করে কাজ নিলেন রেলওয়েতে। কিন্তু মনে যার সৃষ্টির তাড়না, তাঁর কাছে এ কাজ ভাল লাগবে কেন? দু'তিন মাসের বেশি মন টিকলো না সেখানে। ছেড়ে দিলেন সেই নীরস চাকরী। অতঃপর নতুন জীবিকা খুঁজতে গিয়ে এক বন্ধুর পরামর্শে এফডিসির তৎকালিন অপারেটিভ ডিরেক্টর নাজীর আহমেদের সহায়তায় তিনি চলে এলেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর উল্টো দিকে বিজি প্রেসে অবস্থিত চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে। ইলেকট্রিক বিভাগে জয়েন করলেও এদেশের চলচ্চিত্রের উষালগ্নে সব কুশলীকেই সব বিভাগেই কাজ করতে হতো। ২/৩ মাস পরই বুঝতে পারলেন তাঁর ভালো লাগার বিষয় হল সম্পাদনা বিভাগ।

এফডিসির তৎকালিন চলচ্চিত্র সম্পাদক সিরাজগঞ্জের আশু ঘোষ তাঁকে টেনে নেন সম্পাদনা বিভাগে। আশু ঘোষের কাছেই তাঁর সম্পাদনার হাতেখড়ি - ফতেহ লোহানীর *আসিয়া* (১৯৬০) চলচ্চিত্রে। এফডিসির এই প্রথম চলচ্চিত্রে হাতেখড়ির পাশাপাশি অপর চলচ্চিত্র সম্পাদক প্রণব মুখার্জীর সাথে কাজ করলেন *আকাশ আর মাটি* (১৯৫৯)-তে। নিজের সৃষ্টিশীলতার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেললেন সম্পাদনা কুশলতা। ফলশ্রুতিতে হাতেখড়ি নেয়া চলচ্চিত্র *আসিয়া*

র আগেই মুক্তি পেয়ে গেল তাঁর প্রথম সম্পাদিত চলচ্চিত্র *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯-এহতেশাম)। এর পরই শুরু হল বশীর হোসেনের চলচ্চিত্র সম্পাদকের জীবন।

বশীর হোসেন তাঁর ৪৪ বছরের জীবনকালের ২০ বছরের চিত্রসম্পাদনা জীবনে প্রায় ৮০ টির অধিক চলচ্চিত্রে নিজের সৃজনশীল সম্পাদনা কৌশল প্রয়োগ করে স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০-এহতেশাম), *হারানো দিন* (১৯৬১-মুস্তাফিজ), *সূর্যস্নান* (১৯৬২-সালাউদ্দিন), *চান্দা* (উর্দু-১৯৬২-এহতেশাম), *ধারাপাত* (১৯৬৩-সালাউদ্দিন), *তালাশ* (উর্দু-১৯৬৩-মুস্তাফিজ), *বন্ধন* (উর্দু-১৯৬৪-কাজী জহির), *দুই দিগন্ত* (১৯৬৪-ওবায়েদ-উল-হক), *ইয়ে ভি এক কাহানী* (উর্দু-১৯৬৪-এসএম শফি), *অনেক দিনের চেনা* (১৯৬৪-খান আতা), *মেঘ ভাঙ্গা রোদ* (১৯৬৪-কাজী খালেক), *মিলন* (১৯৬৪-রহমান), *সাতরং* (১৯৬৫-ফতেহ লোহানী), *গোধুলীর প্রেম* (১৯৬৫-মহীউদ্দিন), *জানাজানি* (১৯৬৫-আলী মনসুর), *রূপবান* (দ্বিভাষিক - ১৯৬৫-সালাউদ্দিন), *১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন* (১৯৬৫-স্বপরিচালিত), *বেগানা* (উর্দু-১৯৬৬-এসএম পারভেজ), *নবাব সিরাজউদ্দোলা* (দ্বিভাষিক - ১৯৬৭-খান আতা), *অপরাজেয়* (১৯৬৭-এম এ হামিদ), *উলঝন* (উর্দু-১৯৬৭-আজাহার হোসেন), *সোয়ে নদীয়া জাগে পানি* (উর্দু-১৯৬৮-খান আতা), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৬৮-দিলীপ সোম), *তুম মেরে হো* (উর্দু-১৯৬৮-সুরুর বারাবাংকভি), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮-মিতা), *ময়নামতি* (দ্বিভাষিক-১৯৬৯-কাজী জহির), *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯-মিতা), *তানসেন* (দ্বিভাষিক-১৯৭০-রফিকুল বারী চৌধুরী), *মধুমিলন* (দ্বিভাষিক-১৯৭০-কাজী জহির), *আপন পর* (১৯৭০-স্বপরিচালিত), *নাচের পুতুল* (১৯৭১-অশোক ঘোষ), *লালন ফকির* (১৯৭২-হাসান ইমাম), *ওরা ১১ জন* (১৯৭২-চাষী নজরুল ইসলাম), *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩-ঋত্বিক কুমার ঘটক), *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩-খান আতা), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪-মিতা), *লাঠিয়াল* (১৯৭৫-মিতা), *সুজন সখী* (১৯৭৫-প্রমোদকার), *মাটির মায়া* (১৯৭৬-তাহের চৌধুরী), *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬-আব্দুস সামাদ), *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭-আলমগীর কবির) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে এবং কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্রে (*বিদ্রোহী কবি, ফ্লাডস এন্ড টিয়ার্স, গঙ্গা ও গঙ্গা* প্রভৃতি) তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শৈল্পিক ও সৃজনশীল সম্পাদনা কুশলতা। স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তিনবার (১৯৭৫ সালে *লাঠিয়াল*, ১৯৭৬ সালে *মাটির মায়া* ও ১৯৭৭ সালে *সীমানা পেরিয়ে*-র জন্য) অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পাদক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কার।

র আগেই মুক্তি পেয়ে গেল তাঁর প্রথম সম্পাদিত চলচ্চিত্র *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯-এহতেশাম)। এর পরই শুরু হল বশীর হোসেনের চলচ্চিত্র সম্পাদকের জীবন।

বশীর হোসেন তাঁর ৪৪ বছরের জীবনকালের ২০ বছরের চিত্রসম্পাদনা জীবনে প্রায় ৮০ টির অধিক চলচ্চিত্রে নিজের সৃজনশীল সম্পাদনা কৌশল প্রয়োগ করে স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০-এহতেশাম), *হারানো দিন* (১৯৬১-মুস্তাফিজ), *সূর্যস্নান* (১৯৬২-সালাউদ্দিন), *চান্দা* (উর্দু-১৯৬২-এহতেশাম), *ধারাপাত* (১৯৬৩-সালাউদ্দিন), *তালাশ* (উর্দু-১৯৬৩-মুস্তাফিজ), *বন্ধন* (উর্দু-১৯৬৪-কাজী জহির), *দুই দিগন্ত* (১৯৬৪-ওবায়েদ-উল-হক), *ইয়ে ভি এক কাহানী* (উর্দু-১৯৬৪-এসএম শফি), *অনেক দিনের চেনা* (১৯৬৪-খান আতা), *মেঘ ভাঙ্গা রোদ* (১৯৬৪-কাজী খালেক), *মিলন* (১৯৬৪-রহমান), *সাতরং* (১৯৬৫-ফতেহ লোহানী), *গোধুলীর প্রেম* (১৯৬৫-মহীউদ্দিন), *জানাজানি* (১৯৬৫-আলী মনসুর), *রূপবান* (দ্বিভাষিক - ১৯৬৫-সালাউদ্দিন), *১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন* (১৯৬৫-স্বপরিচালিত), *বেগানা* (উর্দু-১৯৬৬-এসএম পারভেজ), *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* (দ্বিভাষিক - ১৯৬৭-খান আতা), *অপরাজেয়* (১৯৬৭-এম এ হামিদ), *উলঝন* (উর্দু-১৯৬৭-আজাহার হোসেন), *সোয়ে নদীয়া জাগে পানি* (উর্দু-১৯৬৮-খান আতা), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৬৮-দিলীপ সোম), *তুম মেরে হো* (উর্দু-১৯৬৮-সুরুর বারাবাংকভি), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮-মিতা), *ময়নামতি* (দ্বিভাষিক-১৯৬৯-কাজী জহির), *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯-মিতা), *তানসেন* (দ্বিভাষিক-১৯৭০-রফিকুল বারী চৌধুরী), *মধুমিলন* (দ্বিভাষিক-১৯৭০-কাজী জহির), *আপন পর* (১৯৭০-স্বপরিচালিত), *নাচের পুতুল* (১৯৭১-অশোক ঘোষ), *লালন ফকির* (১৯৭২-হাসান ইমাম), *ওরা ১১ জন* (১৯৭২-চাষী নজরুল ইসলাম), *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩-ঋত্বিক কুমার ঘটক), *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩-খান আতা), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪-মিতা), *লাঠিয়াল* (১৯৭৫-মিতা), *সুজন সখী* (১৯৭৫-প্রমোদকার), *মাটির মায়া* (১৯৭৬-তাহের চৌধুরী), *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬-আব্দুস সামাদ), *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭-আলমগীর কবির) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে এবং কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্রে (*বিদ্রোহী কবি*, *ফ্লাডস এন্ড টিয়ার্স*, *গঙ্গা ও গঙ্গা* প্রভৃতি) তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শৈল্পিক ও সৃজনশীল সম্পাদনা কুশলতা। স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তিনবার (১৯৭৫ সালে *লাঠিয়াল*, ১৯৭৬ সালে *মাটির মায়া* ও ১৯৭৭ সালে *সীমানা পেরিয়ে*-র জন্য) অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পাদক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কার।

চিত্রসম্পাদনার পাশাপাশি চিত্রপরিচালনাতেও বশীর হোসেন ছিলেন দক্ষ। তাঁর পরিচালিত *১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন* (১৯৬৫) ও *আপন পর* (১৯৭০) চলচ্চিত্র দুটি নির্মাণশৈলী ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে- কমেডি চলচ্চিত্র হিসেবে *১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন* উল্লেখযোগ্য।

চিত্রগ্রহণের মত সম্পাদনা হল চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম প্রধান কারিগরি অঙ্গ। অন্য অনেক কারিগরি কৌশলের প্রয়োজন না থাকলেও সম্পাদনা ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পাদনাও তাই চিত্রগ্রহণের মত একটি শৈল্পিক অনুসঙ্গ। বশীর হোসেন এই শৈল্পিক অনুসঙ্গের একজন সার্থক কুশলী।

বশীর হোসেন বাংলাদেশের চিত্রজগতে শুধু একজন চিত্রসম্পাদক নন, একটি ইনষ্টিটিউশন। তিনিই সর্বপ্রথম এইদেশে শৈল্পিক সম্পাদনার মাধ্যমে বায়োস্কোপকে চলচ্চিত্রে উন্নীত করেছেন। চিত্রসম্পাদনা কেবল একটি ফ্রেম বা দৃশ্যের সাথে অপর একটি ফ্রেম বা দৃশ্যের সংযোগ স্থাপন নয়, বরং সৃজনশীল কৌশলের মাধ্যমে পরিচালক, কাহিনীকার কিংবা কোন চরিত্রের না বলা কথাকে দর্শকের কাছে বোধগম্য ভাবে উপস্থাপন করা। এই কৌশল প্রয়োগে বশীর হোসেন দক্ষ এবং দর্শক, পরিচালক ও প্রদর্শকদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, এদেশে সম্পাদক হিসাবে একমাত্র তাঁর নামে ছবির ডিস্ট্রিবিউশন হত। দর্শকরাও তাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে দেখে সিনেমা হলে প্রবেশ করত।

চিত্রসম্পাদনার পরবর্তী প্রজন্ম তৈরীতেও বশীর হোসেন ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর কাছে কাজ শেখা সহকারীদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে বিখ্যাত চিত্রসম্পাদক হিসাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম মিন্টু, মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ আউয়াল (বাচ্চু), ফজলে হক, আবু মুসা দেবু, মরহুম বুলবুল চোধুরী, মরহুম আলম কোরেশী, মোহাম্মদ আবু তালেব, প্রয়াত দেবনাথ মজুমদার (লালু), আতিকুর রহমান মল্লিক, মাহবুবুর রহমান, আওকাত হোসেন, জালাল আহমেদ, আনোয়ার হোসেন (মন্টু), মুজিবুর রহমান দুলু প্রমুখ সম্পাদনা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

চলচ্চিত্রের সম্পাদনার কাজে বশীর হোসেন ছিলেন একান্ত নিবেদিত প্রাণ- যিনি ক্যান্সারের মত কঠিন রোগে আক্রান্ত হবার পরও প্রবল মনের জোর এবং

ইচ্ছাশক্তি বলে কাজ করে গেছেন অবিরাম। এই চলচ্চিত্রপ্রেমী ত্যাগী, নিপাট বিশুদ্ধ মানুষ ও সৃষ্টিশীল চিত্রসম্পাদকের প্রয়াণ ঘটে ১৯৭৮ সালের ২৩ এপ্রিল রবিবার।

এদেশে চলচ্চিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, চিত্রগ্রাহক সহ অন্য কয়েক শাখার কুশলীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে ইতিপূর্বে গবেষণা ও লেখালেখি হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম অঙ্গ সম্পাদনা কৌশল এবং চিত্রসম্পাদকদের নিয়ে কোন কাজ হয়নি। বশীর হোসেনের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণাটি এই শূণ্যস্থান পূরণ করবে বলে আশা করা যায়। এই মহান চলচ্চিত্র কর্মী ও সৃজনশীল চিত্রসম্পাদকের জীবন ও কর্ম লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ছিল সৃষ্টিশীল শিল্প নৈপূর্ণ্যে ভরপুর। যার অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেন। এই অনুসরণীয় চলচ্চিত্র কর্মীর মৃত্যুতে আমরা হারিয়েছি এক কুশলী চিত্রসম্পাদকে - কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। এই সম্পাদনা কুশলীর জীবন ও কর্ম নিয়ে অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক গ্রন্থটি হবে ভবিষ্যত চলচ্চিত্র জগতের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি অনুসরণীয় এবং প্রেরণামুলক সৃষ্টি। চলচ্চিত্র গবেষকদের উৎসুক্য বিবেচনায় এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয়।

গবেষণা পদ্ধতি

চিত্রসম্পাদক বশীর হোসেনের কর্মময় জীবনের ওপর গবেষণার জন্য বিস্তারিত এবং গ্রহণযোগ্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। উপায়গুলো হল-

১) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, জার্নাল, স্মরণিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত তথ্য।
২) পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, স্মরণিকা, জার্নালে প্রকাশিত বশীর হোসেনের সাক্ষাৎকার, তাঁর কাজের সমালোচনা, আলোচনা, মন্তব্য, উক্তি, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
৩) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
৪) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ গ্রন্থাগার, এফডিসি-র আব্দুর জব্বার খান পাঠাগার,

বাংলাদেশ ফিল্ম এডিটর গিল্ড এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদী।
৬) চলচ্চিত্রের সহকর্মী, পরিবারের সদস্য এবং সহকারীদের সাক্ষাৎকার।
৭) গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ করা বশীর হোসেন বিষয়ক তথ্য, নিদর্শন ও আলোকচিত্র।
৮) পারিবারিক এ্যালবাম, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, এফডিসি এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংগ্রহশালা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত আলোকচিত্র।
উপরোক্ত উৎস্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়েই এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বশীর হোসেন পর্দার অন্তরালের কারিগর। চিত্রসম্পাদনার মত একেবারে কম আলোচিত বিষয় নিয়ে সম্পাদনা কক্ষের চার দেয়ালের মধ্যেই সৃজন করতেন তিনি। প্রকাশ্যে আসতে অনীহা ছিল এই নিভৃতচারীর। ফলে খুব একটা লেখালেখি হয়নি তাঁর ওপর। আবার গবেষণা শুরুর ৩৬ বৎসর আগেই থেমে গেছে বশীর হোসেনের পেশা জীবনের নিত্য সহচর 'মুভিওয়ালা'। ভীষণভাবে সংরক্ষণহীন আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রায় সব কিছুই হারিয়ে গেছে। তাই গবেষণা করতে গিয়ে পদে পদে অনুভব করেছি তাঁর সম্পর্কিত তথ্যাদির অভাব। বড় অভাব তৎকালের পত্রপত্রিকার।

আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে চিত্রসম্পাদনা বিষয়ে পূর্বতন কোন প্রকাশনার অনুপস্থিতি। ইংরেজী সহ অন্য ভাষায় এ বিষয়ে গ্রন্থ থাকলেও বাংলায় তেমন কোন প্রকাশনা নেই। ভারতের পশ্চিম বাংলায় দু'একটি নামমাত্র গ্রন্থ থাকলেও এদেশের একটিও নেই। আমাদের আরও নেই কোন চলচ্চিত্রপঞ্জি বা তালিকা। কোন শিল্পি-কুশলী কোন কোন চলচ্চিত্রে কী ভুমিকা রেখেছেন, তার কোন তথ্য নেই। সহজলভ্য নয় অধিকাংশ চলচ্চিত্রের প্রিন্ট। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণাকে তথ্যবহুল ও নির্ভুল করার জন্য।

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বশীর হোসেনের ঘনিষ্ট সহকর্মী চিত্রপরিচালক হারুনর রশীদ। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশণা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। বশীর হোসেনের সহকারী ও বাংলাদেশ ফিল্ম এডিটর

গিল্ডের বর্তমান সভাপতি আবু মুসা দেবু, প্রবীন চলচ্চিত্র সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মিন্টু, ফজলে হক, আবু তালেব, প্রয়াত দেবনাথ মজুমদার (লালু), আতিকুর রহমান মল্লিক সহ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পাদকবৃন্দ আমাকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক জনাব ড. মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসেনের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সহায়তা এই গবেষণাকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে কোরামিনের ভূমিকা রেখেছে। তাঁর পরামর্শে গবেষণাটি শুধুমাত্র বশীর হোসেনের জীবন ও কর্ম নয়, বরং চলচ্চিত্র সম্পাদনা বিষয়টি নিয়েও কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করার হয়েছে।

ফিল্ম আর্কাইভের সহকারী পরিচালক (মেইনটেন্যান্স) মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, চলচ্চিত্র পরিদর্শক জনাব ফখরুল আলম (সোহাগ), ফিল্ম অফিসার জনাব লিয়াকত আলী, সহকারী লাইব্রেরীয়ান মিস আছমা আক্তার ও তৎকালিন লাইব্রেরীয়ান জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখের সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা অপূর্ণ থেকে যেত। আর একজনের কথা না বললেই নয় - চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ, যিনি আমার চলচ্চিত্র বিষয়ক সব কাজেরই একজন সহায়ক। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

বশীর হোসেনের পরিবার বিশেষ করে তাঁর বড় ছেলে সাজ্জাদ হোসেন বিন্দু ভাই প্রদত্ত তথ্য ও আলোকচিত্র এই গবেষণার উপাদান হিসেবে প্রভূত সাহায্য করেছে। আমার শ্বশুর বাংলাদেশ ফিল্ম এডিটর গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বশীর হোসেনের সহকারী, চলচ্চিত্র সম্পাদক মরহুম আলম কোরেশী (১৯৩৩-২০১১) এর সংগ্রহ থেকে পেয়েছি রেশ কিছু তথ্য। এজন্য আমার সহধর্মিনী ডালিয়া কোরেশীকে ধন্যবাদ। সেই সাথে আরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পরিবারবর্গকে যারা দিনের পর দিন আমার কাজে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাবা মরহুম মীর আব্দুস সামাদ, মা হোসনে আরা বেগম, ছোট ভাই মীর মাহবুব আলম আজাদ, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী আফরোজা খানম লাকী, বোন মাহমুদা আক্তার শেলি, ভগ্নিপতি শাহীন ইসলাম আকন্দ, বোন মাকছুদা আক্তার মিলি, ভগ্নিপতি ফিরোজ ইবনে রউফ, বোন শামীমা আক্তার মায়া এবং ভাগ্নে ভাগ্নি মাহফুজ, শশী, আরাফাত, তামজীদ-এর প্রতি।

আরও ধন্যবাদ চলচ্চিত্র সংগ্রাহক বন্ধু এহসান বকুল, সংগীত সংগ্রাহক গবেষক আসলাম আহসান, সংগীত ও চলচ্চিত্র সংগ্রাহক শহীদুল আলম তিতু, বন্ধু চিত্র পরিচালক এম. শাহীন মাহমুদ এবং সর্বোপরি মো: শরীফুল ইসলামকে যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাকর্ম অসম্পূর্ণ থাকতো।

এই গবেষণা কর্মটি যদি চলচ্চিত্র প্রেমী, ছাত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহীদের কাজে লাগে তবেই এর সার্থকতা। অসাবধানতা বশত: গবেষণা গ্রন্থে কোন ভুল থাকলে তা মার্জনার চোখে দেখার অনুরোধ করছি এবং জানালে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

জুন ২০১৬
আষাঢ় ১৪২৩

মীর শামছুল আলম বাবু
৭০/১ মধ্য পাইক পাড়া,
মিরপুর-১,ঢাকা-১২১৬
০১৭১১-২৪৯৪৬২
০১৯৭১-২৪৯৪৬২
baboo71@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

বশীর হোসেনের জীবন কথা

জন্ম ও বংশ

চলচ্চিত্র সম্পাদক বশীর হোসেনের পুরো নাম মোহাম্মদ বশীর হোসেন মুন্সি। চলচ্চিত্রাঙ্গনে তিনি বশীর হোসেন নামেই সুপরিচিত। তিনি ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর বর্তমান কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার বনকুট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

অবশ্য বশীর হোসেনের ম্যাট্রিকুলেশন সনদে তার জন্ম তারিখ লেখা আছে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭।[২]

তবে পারিবারিক ও আত্মীয় ও সহপাঠিদের সুত্রে জানা যায় যে তার জন্ম সনদপত্রে উল্লেখিত তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া আছে। এই তারিখ নয় বরং অনুপম হায়াৎ লিখিত তারিখটিই সঠিক।

বশীর হোসেনের মাতার নাম জামিলা বেগম আর বাবা মোহাম্মদ সামাদুল হক মুন্সি। বাবা স্কুল শিক্ষক। দেবীদ্বার থানা তথা কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। সর্বশেষ ছিলেন গুনাইগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মাতা জামিলা বেগম গৃহিনী। চার বোন আর তিন ভাইয়ের মধ্যে বশীর হোসেন সবার বড়। বাবা মায়ের পরবর্তী সন্তান মেয়ে–নাম আনোয়ারা বেগম–তার স্বামী খুরশীদ আলম ভূঁইয়াও শ্বশুরের মত স্কুল শিক্ষক। তৃতীয় সন্তান মো: আবু তাহের মুন্সি ব্যবসা করেন। তিনি ঢাকার বাসিন্দা এবং ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই বড় ভাই বশীর হোসেনের কাছাকাছি ছিলেন, কিছুদিন বশীর হোসেনের চলচ্চিত্র প্রযোজনার অফিসের দায়িত্বও পালন করেছেন। পরবর্তী বোনের নাম মনোয়ারা বেগম–তার স্বামী শাহজাহান খানও স্কুল শিক্ষক। পরবর্তী জন রফিকুল ইসলাম মৃত। বশীর হোসেনের বাবা মায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান হলেন সামসুন্নাহার বেগম–তার বিয়ে বশীর হোসেনই দিয়েছেন নিজের খালাতো ভাই চলচ্চিত্রগ্রাহক আব্দুল লতিফ খানের সাথে–যিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনে রেজা লতিফ নামে সুপরিচিত। আর বশীর হোসেনের

সর্বশেষ বোন মোহসেনা বেগম–তার বিয়ে হয়েছে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা আব্দুল আজিজের সঙ্গে।[৩]

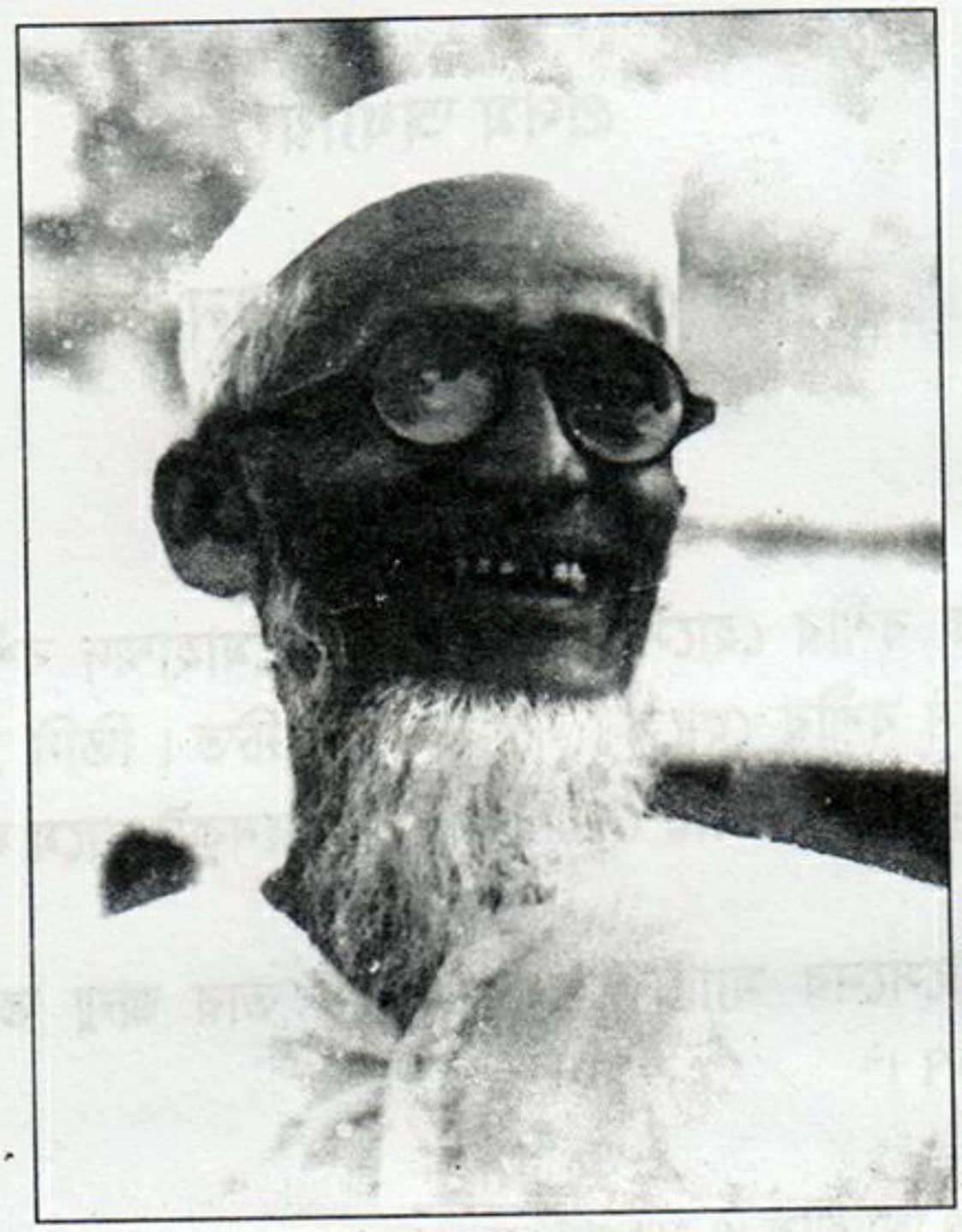

সৌজন্যে : সাজ্জাদ হোসেন

বশীর হোসেনের বাবা সামাদুল হক মুন্সি

ভাই বোনদের মধ্যে সবার বড় হওয়ার কারণে বশীর হোসেন ছিলেন বাবা মায়ের আদরের। শিশু ও কৈশরকাল আর দশটা গ্রাম্য ছেলেদের মতই খেলাধূলা করে কাটিয়েছেন বশীর হোসেন। বিশেষ করে বনকুট গ্রামের পাশের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামেই ছিল কিশোর বশীরের বিচরণ। গ্রাম্য পথে, মাঠে, ঘাটে খেলা, নদীতে মাছ ধরা, ঘুড়ি উড়ানো প্রভৃতি নিয়েই কাটতো তাঁর শিশুকাল। বাবা স্কুল শিক্ষক, বদলীর চাকুরী, খুব একটা থাকতেন না বাড়িতে - ফলে দেখার কেউ নেই, শাসন করার কেউ নেই আর তৎকালে সমাজ ব্যবস্থা আর গ্রাম্য পরিবেশও ছিল সহজ সরল– সব মিলিয়ে ভালই কেটে যাচ্ছিলো কিশোর বশীরের জীবন।

বশীর হোসেনের দাদার নাম ওয়াসিমউদ্দিন মুন্সি। দেবীদ্বার থানায় মুন্সি বংশের বেশ নাম ডাক ছিল। তাঁর অন্য দুই সন্তান অর্থাৎ বশীর হোসেনের দুই চাচা ফকরুল ইসলাম মুন্সি ও নজরুল ইসলাম মুন্সি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। এই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ মন্ত্রি, সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য প্রশাসনিক জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। তবে বশীর হোসেন রাজনীতির মধ্যে ছিলেন না - তিনি কৈশোরে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন।

শিক্ষা

তৎকালের সমাজ ব্যবস্থানুযায়ী একটু বেশি বয়সেই বশীর হোসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমে গ্রাম্য মক্তবেই শুরু হয় অধ্যয়ন। অবশ্য মক্তবে তিনি কত বছর পড়াশোনা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সহপাঠি ও সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় তিনি গ্রাম্য মাদ্রাসায় বেশ কয়েক বছর পড়াশোনা করেছেন এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সময় আজানও দিতেন।[৪]

গ্রাম্য মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পর বশীর হোসেনকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় দেবীদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল হাই স্কুলে। দেবীদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল হাই স্কুল ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি প্রথমে ছিল একটি প্রাইমারী স্কুল। নওয়াব স্যার কাজী গোলাম মহিউদ্দিন ফারুকী (কে. জি. এম ফারুকী) ১৯১৮ সালে এটিকে হাইস্কুলে রূপান্তর করেন এবং সরকারী স্থায়ী মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করে দেন। স্কুলটির মোট জমির পরিমাণ ৫.৬৩ একর এবং এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু বসন্তকুমার দাস। যিনি একটানা ৪৪ বৎসর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠ থেকে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন।[৫]

বশীর হোসেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এই প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার দাসের অধীনেই অধ্যয়ন করেছেন। স্কুল শিক্ষক বাবার সন্তান হলেও সবার বড় ও সবার আদরের হওয়ায় এবং অধ্যয়নের চেয়ে পাশের গ্রামের বন্ধু বান্ধবদের সাথে বেশি সময় কাটানোয় বশীর হোসেনের পড়াশোনা তেমন ভাল হয়নি। মাঝে পড়াশোনার বিরতিও ছিল। গ্রাম্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা ছাড়াও মাঝে মাঝে গান বাজনা ও নাটকে অংশ নিতেন বশীর হোসেন। সেখান থেকেই তাঁর সংস্কৃতিমনস্কতার জন্ম। রক্ষণশীল বাবা সামাদুল হক মুন্সির পছন্দ ছিল না এসব। কিন্তু তিনি সময় পেতেন কম তাই তার মন মতো ছেলেকে দেখাশোনা করতে পারেন নি। তবে ছেলে অধ্যয়নের বাইরে সাধারণ দুষ্টুমী করলেও অন্য কিছুর সাথে জড়িত হয়নি।

পড়াশোনায় তেমন ভাল না হওয়ায় এবং অধ্যয়ন বিরতি হওয়ায় বাবা সামাদুল হক মুন্সি বশীর হোসেনকে ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী বরকান্তা গ্রামে পাঠিয়ে দেন। কুমিল্লা শহরের চান্দিনায় অবস্থিত বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন গ্রাম বরকান্তায় অবস্থিত 'বরকান্তা গভমেন্ট এইডেড হাইস্কুল'-এ ভর্তি হয়ে, দাদার বোনের বাড়ীতে জায়গীর থেকে বশীর হোসেন অধ্যয়ন করতে থাকেন।

শিক্ষা

তৎকালের সমাজ ব্যবস্থানুযায়ী একটু বেশি বয়সেই বশীর হোসেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথমে গ্রাম্য মক্তবেই শুরু হয় অধ্যয়ন। অবশ্য মক্তবে তিনি কত বছর পড়াশোনা করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে সহপাঠি ও সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায় তিনি গ্রাম্য মাদ্রাসায় বেশ কয়েক বছর পড়াশোনা করেছেন এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সময় আজানও দিতেন।[৪]

গ্রাম্য মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পর বশীর হোসেনকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় দেবীদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল হাই স্কুলে। দেবীদ্বার রেয়াজউদ্দিন পাইলট মডেল হাই স্কুল ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি প্রথমে ছিল একটি প্রাইমারী স্কুল। নওয়াব স্যার কাজী গোলাম মহিউদ্দিন ফারুকী (কে. জি. এম ফারুকী) ১৯১৮ সালে এটিকে হাইস্কুলে রূপান্তর করেন এবং সরকারী স্থায়ী মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করে দেন। স্কুলটির মোট জমির পরিমাণ ৫.৬৩ একর এবং এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু বসন্তকুমার দাস। যিনি একটানা ৪৪ বৎসর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠ থেকে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন।[৫]

বশীর হোসেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এই প্রধান শিক্ষক বসন্তকুমার দাসের অধীনেই অধ্যয়ন করেছেন। স্কুল শিক্ষক বাবার সন্তান হলেও সবার বড় ও সবার আদরের হওয়ায় এবং অধ্যয়নের চেয়ে পাশের গ্রামের বন্ধু বান্ধবদের সাথে বেশি সময় কাটানোয় বশীর হোসেনের পড়াশোনা তেমন ভাল হয়নি। মাঝে পড়াশোনার বিরতিও ছিল। গ্রাম্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা ছাড়াও মাঝে মাঝে গান বাজনা ও নাটকে অংশ নিতেন বশীর হোসেন। সেখান থেকেই তাঁর সংস্কৃতিমনস্কতার জন্ম। রক্ষণশীল বাবা সামাদুল হক মুন্সির পছন্দ ছিল না এসব। কিন্তু তিনি সময় পেতেন কম তাই তার মন মতো ছেলেকে দেখাশোনা করতে পারেন নি। তবে ছেলে অধ্যয়নের বাইরে সাধারণ দুষ্টুমী করলেও অন্য কিছুর সাথে জড়িত হয়নি।

পড়াশোনায় তেমন ভাল না হওয়ায় এবং অধ্যয়ন বিরতি হওয়ায় বাবা সামাদুল হক মুন্সি বশীর হোসেনকে ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী বরকান্তা গ্রামে পাঠিয়ে দেন। কুমিল্লা শহরের চান্দিনায় অবস্থিত বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন গ্রাম বরকান্তায় অবস্থিত 'বরকান্তা গভমেন্ট এইডেড হাইস্কুল'-এ ভর্তি হয়ে, দাদার বোনের বাড়ীতে জায়গীর থেকে বশীর হোসেন অধ্যয়ন করতে থাকেন।

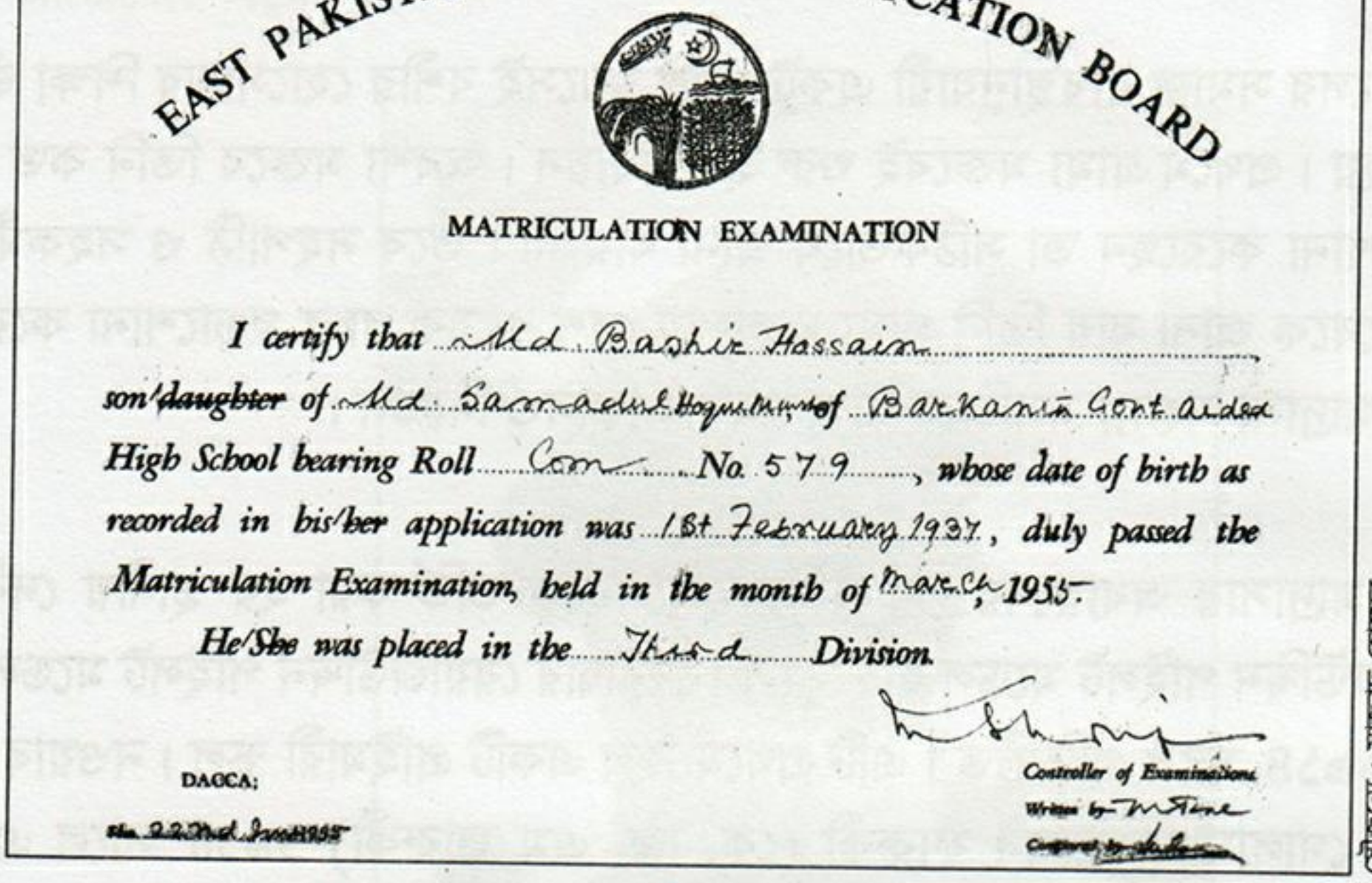

EAST PAKISTAN SECONDARY EDUCATION BOARD

MATRICULATION EXAMINATION

I certify that Md Bashir Hossain

son/daughter of Md Samadul Hoque ... *of* Barkanta Govt aided *High School bearing Roll* Com *No.* 579, *whose date of birth as recorded in his/her application was* 1st February 1937, *duly passed the Matriculation Examination, held in the month of* March, *1955.*

He/She was placed in the Third *Division.*

DACCA;

the 22nd June 1955

Controller of Examinations

Written by

Compared by

বশীর হোসেনের ম্যাট্রিকুলেশন সনদ- ১৯৫৫

সৌজন্যে : সাজ্জাদ হোসেন

এই বরকান্তা থেকে বশীর হোসেন ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকায় আগমন করেন- উদ্দেশ্য উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হবেন। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন ফলাফল ভাল না হওয়ায় তিনি ঢাকার তৎকালে বিখ্যাত কলেজ গুলোতে ভর্তি হবার সুযোগ পাননি। অতঃপর সিদ্ধান্ত নেন কোন কলেজে নাইট শিফটে অধ্যয়ন করবেন। ততদিনে পিতার সংসারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। ফলে বশীর হোসেন 'হাতে কলমে কাজ করবেন' এজন্য কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য ভর্তি হন সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে'।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেশের যুব শক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ১৯৫৫ সালে ৪টি বিভাগ (সিভিল, ইলেকটিক্যাল, মেকানিক্যাল ও পাওয়ার) নিয়ে গঠিত হয় এই ভূখণ্ডের প্রথম পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট 'ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট'। সদ্য নির্মিত তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত এই ইন্সটিটিউটের প্রথম ব্যাচের মোট ১২০ জন ছাত্রের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি। বশীর হোসেনের বিষয় ছিল 'ইলেকট্রিক্যাল'। ১ বছর মেয়াদী এই 'বেসিক ট্রেড কোর্স' সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেন বশীর হোসেন। তারপরই যোগ দেন তাঁর প্রথম কর্মজীবন রেলওয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে-১৯৫৬ সালে।

বশীর হোসেন জীবনের প্রথম চাকুরী করেন রেলওয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে। রেলপথ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের জন্য খুবই উপযোগী একটি গণপরিবহন ব্যবস্থা। বৃটিশ শাসনামলের একটি ভাল কাজের নিদর্শন হল ভারতীয় উপমহাদেশে রেল ব্যবস্থার প্রচলন। ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে রেলপথে যাত্রী পরিবহন শুরু হয়। ভারতীয় রেল বিভাগের পূর্ব অঞ্চলের একটি অংশই বৃটিশদের শাসন অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের অন্তর্গত হয়েছে। এই রেল বিভাগের প্রধান কার্যালয় তখন ছিল চট্টগ্রামে। ঢাকা তখন পূর্ববঙ্গ আর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকার রেলপথের গুরুত্বও ততদিনে বেড়েছে এবং ফুলবাড়ীয়া (আজকের গুলিস্তান সংলগ্ন এলাকা) রেল স্টেশন কেন্দ্রিক যোগাযোগ রাজধানী ঢাকার অন্যতম যোগাযোগ ব্যবস্থা। বশীর হোসেন ১৯৫৬ সালে 'পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট' থেকে ইলেকট্রিক বিভাগে ১ বৎসরের ট্রেড কোর্স সমাপ্ত করে এখানেই চাকুরী নেন এবং দু'তিন মাস পরেই ছেড়ে দেন এই নিরস চাকুরি। এরপর নতুন জীবিকা খুঁজতে খুঁজতে তিনি যোগ দেন এই ভূখণ্ডের চলচ্চিত্র নির্মাণের সূতিকাগার - সদ্য নির্মিত পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বা ইপিএফডিসিতে।[৬]

এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা নিয়মিতভাবে শুরু হয়। এবং এই শুরুর পর্বেই একজন কুশলী হিসেবে যোগ দেন বশীর হোসেন। এফ.ডি.সি তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নামেই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টেকনিশিয়ান নেই, শিল্পি নেই। এমন কি মেশিনপত্র সব এসে পৌছায়নি। কিন্তু এরই মধ্যে ছবি তৈরি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছবির সুটিং পরবর্তী কাজগুলো যেমন প্রসেস, ডেভেলপ, সম্পাদনা ও শব্দগ্রহণ করার লোক নেই তখন এফ.ডি.সিতে। কলকাতার স্টুডিওতে চলচ্চিত্রে কাজ করা দুই এদেশীয় সন্তান আশু ঘোষ ও প্রণব মুখার্জীকে আনা হলো। প্রথমজন প্রজেকশনিষ্ট ও দ্বিতীয় জন সম্পাদক। কিন্তু দুজনকেই মোটামুটি সব কিছুই করতে হতো। তখন এফ.ডি.সি কতৃপক্ষ শিক্ষানবিশ হিসেবে কিছু লোক নিয়োগ করলেন।[৭]

বশীর হোসেনকে এফডিসিতে যোগদানে সহযোগিতা করেন তৎকালে তাঁর বসবাসকারী বংশালের মেস মালিক এবং পরবর্তীকালে তাঁর শ্বশুর আব্দুল্লাহ সাহেব এর স্ত্রী অর্থাৎ তার হবু শ্বাশুড়ী উম্মে আয়েশা বেগম।[৮]

আব্দুল্লাহ সাহেবদের পরিবারের সাথে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রিক সম্পর্ক ছিল ঢাকার আরেক বনেদী পরিবার কাদের সর্দারদের পরিবারের সাথে। সেই সুবাদে কাদের সর্দারের ছোট ভাই মির্জা ফকির মোহাম্মদের পঞ্চম সন্তান এফডিসির প্রথম অপারেটিভ ডাইরেক্টর নাজীর আহমেদের সাথেও ছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক। আব্দুল্লাহ সাহেবের অনুরোধেই বশীর হোসেন দেখা করেন নাজীর আহমদের সাথে।

> তখনকার এফডিসি প্রধান নাজীর আহমদ তাকে এফডিসির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখতে বললেন। কয়েক মাস এভাবে কেটে গেল।[৯]

বশীর হোসেন প্রথমে ২/৩ মাস চাকুরীও করেছেন রেলওয়ের বিদ্যুৎ বিভাগে। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল একটি সৃজনশীল মন। এফডিসির তৎকালের নিয়মে সব বিভাগেই কাজ করার সময়ই তিনি আকৃষ্ট হন সম্পাদনা বিভাগের প্রতি। মূলত সব কাজ করলেও সিরাজগঞ্জের সন্তান আশুতোষ ঘোষ আর প্রণব মুখ্যোপাধ্যায় তখন সামলাচ্ছেন এফডিসির সম্পাদনা বিভাগ। এফডিসি-র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সরকারী জনসংযোগ বিভাগের চলচ্চিত্র বিভাগ (ফিল্ম ডিভিসন) থেকে ১৯৫৭ সালে নির্মাণ শুরু হওয়া *লাইফ ইন ইস্ট পাকিস্তান* নামের প্রামাণ্যচিত্রটি এফডিসি হবার পর নাম পরিবর্তীত হয়ে *আসিয়া* নামে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে ১৯৫৭ সালের ২০ মে তারিখ থেকে নির্মিত হতে থাকে। এটিই নির্মাণ কাজ শুরুর দিক থেকে এফডিসির প্রথম চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের সম্পাদক আশু ঘোষ বশীর হোসেনকে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজে নেন-

> কর্পোরেশনের তৎকালীন সম্পাদক আশু ঘোষ তাকে টেনে আনেন সম্পাদনা বিভাগে। আশু ঘোষের কাছেই হয়েছিল তাঁর চিত্র সম্পাদনার হাতেখড়ি। 'আকাশ আর মাটি' ছবিতে তিনি প্রণব মুখার্জীর সহকারী হিসেবেও কাজ করেছিলেন। প্রণব বাবুও ছিলেন তাঁর শিক্ষা গুরু।[১০]

বশীর হোসেন সহকারী হিসেবে আশু ঘোষের 'আসিয়া' এবং প্রণব মুখার্জীর 'আকাশ আর মাটি' চলচ্চিত্র দুইটি ছাড়াও আশু ঘোষের অন্য চলচ্চিত্র 'মাটির পাহাড়' এর সম্পাদনা সহকারী ছিলেন - বলে জানা যায় এপ্রিল ১৯৬৭ তে প্রকাশিত সচিত্র ঝিনুক পত্রিকার ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়। তবে 'মাটির পাহাড়' ছবির প্রচার পত্রে সম্পাদনা সহকারী হিসেবে বশীর হোসেনের নাম পাওয়া যায়নি। সেখানে আশু ঘোষের সহকারী হিসেবে ইনামুল হক (এনামুল হক) নামটি পাওয়া যায়।[১১]

এদেশের চলচ্চিত্র জগতের চিত্র সম্পাদনার ধারায় বশীর হোসেনের সমান্তরালে

সংসার জীবন

চলচ্চিত্র সম্পাদক ও চিত্রপরিচালক মোহাম্মদ বশীর হোসেনের স্ত্রীর নাম উম্মে সাহিদা স্বপ্না। ১৯৬৫ সালে তাদের বিয়ে হয়। সাহিদা হোসেন স্বপ্নারা পুরাতন ঢাকার বংশালে থাকতেন। তার মায়ের নাম উম্মে আয়েশা বেগম, বাবার নাম এম.এম আব্দুল্লাহ। তিনি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটি-টিউট (বর্তমানের বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, গাবতলী) এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাছাড়া একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি নয়াবাজারের হাম্মাদীয়া হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ৪ কন্যা ও ১ পুত্রের মধ্যে সাহিদা হোসেন ছিলেন মধ্যম।

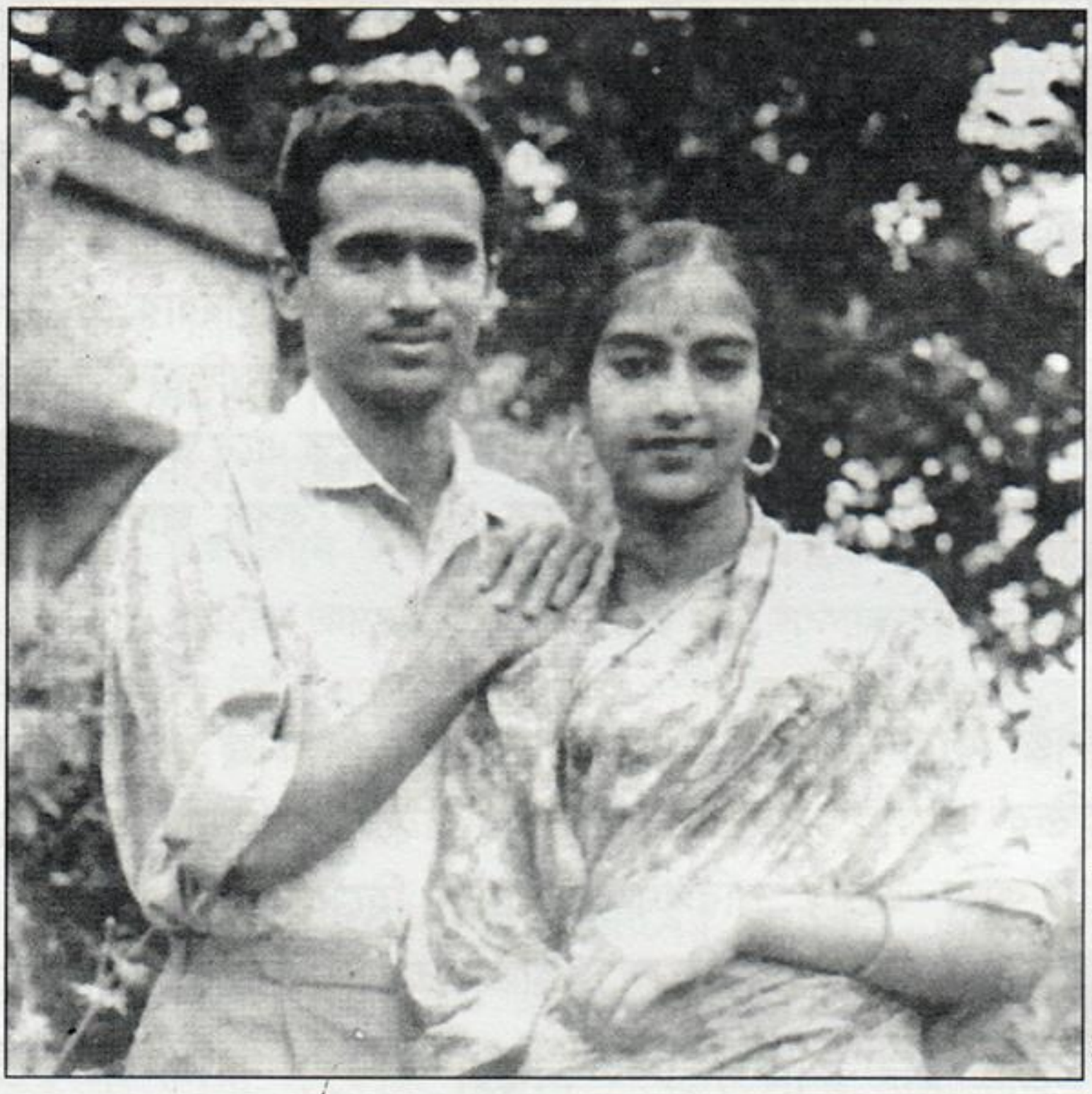

সৌজন্যে : সাজ্জাদ হোসেন

স্ত্রী সাহিদা হোসেন স্বপ্না সহ

উম্মে সাহিদারা ৫ বোন, এক ভাই। বড় তিন বোন উম্মে হাসিন, উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা'র পর উম্মে সাহিদা'র জন্ম। তার ডাক নাম স্বপ্না। তার পরবর্তী বোন উম্মে রাশিদা এবং ভাই আহমেদ বিন আব্দুল্লাহ (খোকন)। বশীর হোসেনের এই শ্যালক কিছুদিন ঢাকার চলচ্চিত্রে জড়িত ছিলেন। তিনি চিত্রনায়িকা শাবানা'র ছোট বোনের স্বামী ছিলেন এবং বর্তমানে প্রবাসী।

বশীর হোসেন কুমিল্লার দেবীদ্বার থেকে ঢাকায় এসে যখন ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন তখন বংশালে মেসে থাকতেন। সেই মেসটাই ছিল আব্দুল্লাহ সাহেবদের। মেস মালিকের পরিবারের সাথে বশীর হোসেনের ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়। এই আব্দুল্লাহ সাহেবই বশীর হোসেনকে এফডিসিতে যোগ দিতে সহায়তা করেন।

বশীর হোসেন আব্দুল্লাহ পরিবারে যাতায়াত করতেন। তখন থেকেই সাহিদা স্বপ্নার সাথে তার জানাশোনা তৈরী হয়। বশীর হোসেন তখন এফডিসিতে চলচ্চিত্র সম্পাদনার জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মাঝে মধ্যে গ্রামে গেলে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদের একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে মেয়েটি কেমন তা জিজ্ঞাসা করতেন।[১৪]

বশীর হোসেনের ছোট ভাই বোনেরা ছবির মেয়েটিকে পছন্দ করতেন। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালই ছিলেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালের ১১ জুলাই বশীর হোসেন-সাহিদা স্বপ্নার বিয়ে হয়। বশীর হোসেন তাঁর বাবা সামাদুল হক মুন্সি ও মা জামিলা বেগমের অনুমতি নিয়েই এই বিয়ে করেন। নয়াবাজারের হাম্মাদীয়া হাইস্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক মৌলভী আব্দুর রাজ্জাকের সহায়তায় বাবা সামাদুল হক মুন্সির অনুমুতি আদায় করেছিলেন বশীর হোসেন। হাম্মাদীয়া হাই স্কুলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বশীর হোসেনের স্ত্রীর বড় বোনের স্বামী। বিয়ের পরের মাসে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ (৫ আগস্ট ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) চলাকালে বশীর হোসেন - সাহিদা স্বপ্না দম্পতি বংশাল এলাকাতেই আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার জীবন শুরু করেন।

বশীর - সাহিদা দম্পতির ৪ সন্তান - তিন ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে সাজ্জাদ হোসেন বিন্দুর জন্ম ১৯৬৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর। বাবা বশীর হোসেনের কোলে থাকা অবস্থায় মিতা পরিচালিত 'এতটুকু আশা' (১৯৬৮) চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যে সাজ্জাদ হোসেন বিন্দুকে দেখা গেছে। তিনি চলচ্চিত্রের লোকদের কাছে অন্য ভাই বোনদের তুলনায় বেশি পরিচিত। চিত্রপরিচালক কাজী জহিরের ছেলে সাগর, চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের ছেলে জয় ইসলাম, চিত্রগ্রাহক আব্দুস সামাদের মেয়ে কবিতা সামাদ ছিলেন সাজ্জাদ হোসেনের বিন্দুর সমবয়সী বন্ধু ও সহপাঠি। তার স্ত্রীর নাম সালমা মল্লিক এবং একমাত্র ছেলের নাম সাইফ হোসেন (জন্ম ০৮-০৪-১৯৯৫)। স্নাতক সাজ্জাদ হোসেন বর্তমানে একটি এয়ারলাইন্সে চাকুরীরত।